জননেতা ও রাষ্ট্রপিতা;
তুলনামূলক মূল্যায়ন

শেখ মুজিব : জীবনের দুই পর্বে

আহমাদ মাযহার

বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনে শেখ মুজিবের আবির্ভাব এমন একটা সময়ে যখন ভারতবর্ষের রাজনীতিতে সমাজের সামন্ত বা ধনী অংশের প্রতিনিধিত্বের পর্ব অতিক্রম করে মধ্যবিত্ত অংশের প্রতিনিধিত্ব শুরু হয়ে গেছে। ততদিনে বাংলার রাজনীতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাষচন্দ্র বসু, এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি, আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখ রাজনীতিবিদ। তরুণ রাজনীতিক হিসাবে শেখ মুজিব ঘনিষ্ঠ সাহচার্য পেয়েছেন এ কে ফজলুল হক, আবুল হাশিম, হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দি ও আবদুল হামিদ খান ভাসানীর। সুতরাং বলা চলে মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার বলয়েই তাঁর বিকাশ। কালক্রমে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দূরদৃষ্টি, সাংগঠনিক যোগ্যতা, বাগ্মিতা, দুঃসাহস, অত্যাচার-নির্যাতনের মুখেও অনমনীয় থাকা ইত্যাদি গুণের সমন্বয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন এই রাজনীতির প্রধান নিয়ন্ত্রক ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতীক-মানুষ। দীর্ঘ নয়মাসের যুদ্ধকালে তিনি শত্রুর কারাগারে বন্দি থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন মুক্তিকামী বাঙালি জাতির নেতা। একটা সময় এমন হয়েছিল যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ তাকিয়ে ছিল তাঁর দিকে। দেশের অভ্যন্তরে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তাঁর ভাবমূর্তি এত উঁচুতে উঠেছিল যে, অধিকাংশ বাঙালি মনে করত তিনিই সকল মুশকিল আসানের ক্ষমতাধারী। সেসময় তাঁর প্রতি বর্ষিত হতো কেবল স্তুতিবাক্য। কিন্তু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির জটিল ঘূর্ণাবর্তে মানুষ শেখ মুজিব সর্বার্থে সফল হতে পারেন নি। মানুষের প্রত্যাশা যতটা দ্রুত চূড়ায় উঠেছিল, হতাশাও ভূমিতে নেমে আসছিল ততটাই দ্রুত। কিন্তু অতি প্রত্যাশা বা অতি হতাশা কোনওটাই প্রকৃত বাস্তবের অনুকূল নয়। সবক্ষেত্রেই মহৎ মানুষেরা উত্তরকালে বিবেচিত হয়েছেন বাস্তবতার নিরিখে। শেখ মুজিবের ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই এর ব্যতিক্রম হবে না।

১৯৭১ সালের ১০ জানুয়ারি এবং এর কাছাকাছি সময়ে তাঁর ভাবমূর্তি ছিল সবচেয়ে উচ্চে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টে যখন তাঁকে হত্যা করা হয় তার কাছাকাছি সময়ে তাঁর ভাবমূর্তি নিচের দিকে নেমে এসেছিল। এর কারণ অনেকটাই

ছিল আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রমূলক রাজনীতি। সন্দেহ নেই বেশকিছু ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যর্থতা তাঁর ছিল। পাকিস্তানপন্থী ও বামপন্থী উভয় ধারার বিরুদ্ধবাদী প্রচারণাও ছিল প্রবল। মৃত্যুর অব্যবহিত-উত্তরকালে স্বাধীনতা বিরোধী গোষ্ঠী অধিষ্ঠিত হয়েছিল রাষ্ট্রক্ষমতায়। তাদের দ্বারা সৃষ্ট বিরুদ্ধবাদী গুজবের মাধ্যমে এবং গণমাধ্যমে তাদের একচেটিয়া বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারণায় ভাবমূর্তির এই পতন ঘটতে পেরেছিল।

পরাধীন দেশে দূরদৃষ্টি ও সাফল্যজনক সাংগঠনিকতার ফলে নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে তিনি স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে ক্রমশ স্বাধীনতার সংগ্রামে রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন। পরিণতিতে বাঙালি পেয়েছিল স্বাধীন দেশ। সে হিসাবে তাঁর জীবনের সাফল্যের এই অধ্যায়কে বিজয়ের পর্ব হিসাবে অভিহিত করা যেতে পারে। স্বাধীনতা উত্তরকালে নির্মমভাবে হত্যার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর নেয়া কৌশলগত ও সাংগঠনিক অধিকাংশ পদক্ষেপকে হয় পরিত্যাগ করা হয়েছে, না হয় করা হয়েছে বিকৃত। এই যে তাঁর গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা নিজের দ্বারা নির্দেশিত পথে চলতে পারে নি, এটা তাঁরই ব্যর্থতা। সুতরাং তাঁর জীবনের এই পর্বকে ব্যর্থ পর্ব বা পরাজয়ের অধ্যায় বলে অভিহিত করা যায়। এই ব্যর্থতার ফলে তাঁর মৃত্যুত্তর বাংলাদেশ যে নতুন এক সংকটের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে নতুন রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁর রাজনৈতিক কার্যক্রমগুলো উত্তরকালে তাঁর হাতে কতটা সাফল্য পেতো বা কতটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতো তা বিচার করে দেখবার পর্যাপ্ত সুযোগ বাংলাদেশের মানুষ পায়নি। এ-কথা মানতে হবে যে শেখ মুজিবের সমগ্র রাজনৈতিক জীবনের দুটি পর্বই ছিল চরমভাবে সংগ্রামসংকুল। বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য তাঁর জীবনের বিজয়ী ও পরাজিত এই দুই সংগ্রামশীল পর্বকেই বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। এই বিচারকে হতে হবে নির্মোহ ও বস্তুনিষ্ঠ। বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর জীবন যেমন অবিচ্ছেদ্য তেমনি সম্পৃক্ত বাংলাদেশের ভবিষ্যতের স্বার্থের সঙ্গেও। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্বার্থে তাঁর জীবনকে পুরোপুরি পাশ কাটিয়ে যাওয়া যাবে না– এই সত্য না মেনে উপায় নেই। সে কারণে তাঁকে নিয়ে রচিত হয়েছে অনেক বই, ভবিষ্যতে আরও হবে। এই দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মিল রয়েছে। বাঙালির সাহিত্যকে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের অবদান যতটুকু তার তুলনায় বিশ্বব্যাপী বাঙালির জাতীয় পরিচয়ের ক্ষেত্রে শেখ মুজিবের অবদান তারও চেয়ে বেশি। দীর্ঘকালব্যাপী নানা অপপ্রচার সত্ত্বেও সাম্প্রতিককালে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান বিবিসির বিশ্বব্যাপী বাঙালিদের মধ্যে পরিচালিত জরিপেও তাঁর নাম শীর্ষদেশে থাকার মধ্য দিয়ে এই সত্যটিই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের আগের পাকিস্তানি আমলের ২৪ বছর ধরে তাঁর রাজনীতিক সত্তার বিকাশ। তবে সমকালীন প্রবীণতর নেতাদের ছাড়িয়ে শেখ মুজিবের নাম শীর্ষে আসে ষাটের দশকে তাঁর নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির মৃত্যুর পর থেকে। তিনি স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে সত্যিকারভাবে নাড়া দিতে পেরেছিলেন ১৯৬৬ সালে ছয়দফা ঘোষণার মধ্য দিয়ে। ১৯৬৩ সালের দিকে শেখ মুজিব চেয়েছিলেন আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করে রাজনৈতিক তৎপরতা চালাতে। কিন্তু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি, আতাউর রহমান খান, নুরুল আমিন প্রমুখ প্রবীণ নেতা রাজনৈতিক দলের পুনরুজ্জীবনের পক্ষে ছিলেন না। তাঁদের যুক্তি ছিল ফ্রন্ট ভেঙে রাজনৈতিক দলের পুনরুজ্জীবন ঘটলে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ক্ষতি হবে। শেখ মুজিবের নেতা সোহরাওয়ার্দিও এই মত পোষণ করতেন। শেখ মুজিব তাঁকে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেন। এমনকি চিকিৎসারত নেতাকে বোঝাবার জন্য তিনি লন্ডন পর্যন্ত যান। সোহরাওয়ার্দি রাজি না হলে তিনি অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। ১৯৬৩ সালের ৫ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দি মৃত্যুবরণ করলে এনডিএফ-এর নেতৃত্বে সংকট দেখা দেয়। তখন ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে শেখ মুজিব মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের বাড়িতে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত সকলকে প্রভাবিত করে আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবন ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেন। মাত্র অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে মওলানা ভাসানী ও অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ তাঁদের নেতৃত্বাধীন ন্যাপও পুনরুজ্জীবিত করেন। আওয়ামী লীগের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে দলীয় নেতা হিসাবে শেখ মুজিবের শীর্ষ অবস্থান সংহত হয়। দলের পুনরুজ্জীবনকে সমর্থন না করে আতাউর রহমান খান পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়ায় অংশ নেননি। এমনকি তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতি থেকেই নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন। এরপর থেকে শেখ মুজিব সফর করেন সমগ্র বাংলাদেশ। দলকে সংহত করেন। আনাচে কানাচে দেশের মানুষের মনোভাবের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হন। নিজের ভাবনা দ্বারা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। ইউনিয়ন পর্যায়ে, গ্রাম পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ সকল মানুষকে তিনি নিয়ে নেন স্মৃতিতে। সেই সময়ই প্রকৃতপক্ষে তিনি জাতীয় নেতা হয়ে উঠতে থাকেন। ১৯৬৬ সালে ছয়দফা ঘোষণার পক্ষে পটভূমিও তখনই গড়ে ওঠে। ছয়দফা ঘোষণা হয়ে গেলে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর তা হজম করা ছিল অসম্ভব। ছয়দফা নিয়ে নানা অপপ্রচারের আশ্রয় নেয় পাকিস্তান সরকার। কিন্তু শেখ মুজিব তো পিছ-পা হলেনই না, উল্টো মানুষের কাছে ছয়দফার দাবিকে আরও পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করতে থাকলেন। বলা যায় এই ছয়দফাই তাঁকে অন্যান্য জাতীয় নেতা থেকে, যথা মওলানা ভাসানী বা আতাউর রহমান খান প্রমুখের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে যায়। তারপরে তাঁর উপর নেমে আসে আইয়ুব শাহী নির্যাতন। তাঁকে অভিযুক্ত করা হয় ষড়যন্ত্রমূলক মামলায়। কিন্তু

এতেও তাঁর ভাবমূর্তি কমে না, বরং বাড়ে। ১৯৭১ পর্যন্ত তিনি একের পর এক এমনভাবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো নিতে থাকলেন, যে তিনি হয়ে উঠলেন অবিসংবাদিত নেতা। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে তাঁর পাকিস্তানিদের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া নিয়ে বিতর্ক রয়েছে । অনেকে মনে করেন ঐ সময়ে তাঁর উচিত ছিল পালিয়ে যাওয়া ও সরাসরি যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়া। যাঁরা এমনটি মনে করেন তাঁরা লক্ষ করেন না যে, যদি শেখ মুজিব ভারতে আশ্রয় নিতেন তাহলে বাধ্য হতেন ভারতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকতে। মওলানা ভাসানী বা মণি সিংহ বা অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদের মতো প্রায় বন্দিজীবন কাটাতে হতো তাঁর। শত্রুর কারাগারে থাকায় তিনি পরিণত হয়েছিলেন স্বাধীনতার প্রতীকে। আন্তর্জাতিক সমাজের কাছে ভারত সরকারকে তাঁর মুক্তি দাবি করতে হয়েছে। দেশের মানুষের মধ্যেও জেগে উঠেছে অনমনীয় মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। তাঁর মুক্তির দাবিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে বাংলাদেশ কেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক রাজনীতি। এই সিদ্ধান্তের মধ্যে একইসঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও রাষ্ট্রনায়কোচিত পরিপক্বতার পরিচয় পাওয়া যায়। যুদ্ধশেষে মুক্তির ঠিক আগে তাঁকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশন গোছের একটা সম্পর্ক বহাল রাখার জন্য। তখনও তাঁর স্পষ্টভাবে জানা ছিল না দেশ স্বাধীন হয়েছে কি না। তিনি বলেছিলেন জনগণের সঙ্গে কথা না বলে তিনি কোনও আলোচনায় যেতে রাজি নন। এই ক্ষেত্রেও তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া গেছে। মুক্ত মুজিবকে নিয়ে বিমান উড্ডীন হওয়ার পর তাঁকে কোথায় পৌঁছাতে হবে জানতে চাওয়া হলে, তিনি দিল্লি না গিয়ে তৃতীয় নিরপেক্ষ স্থান লন্ডনে যেতে চান। দেশে ফেরার পথে দিল্লিতে যাত্রাবিরতিকালে উপহার হিসাবে কী পেলে তিনি খুশি হবেন ইন্দিরা গান্ধী জানতে চাইলে শেখ মুজিব বাংলাদেশ থেকে অবিলম্বে ভারতীয় সৈন্যদের প্রত্যাহার চান। এই ঘটনাটিকে শুধু দূরদর্শিতা বললে কম বলা হবে। কারণ বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠায় এটিও ছিল একটি উল্লেখযোগ্য দিক। ১৯৪৭-এর দেশবিভাগের পর সংবিধান রচনায় বিলম্ব ঘটবার কারণে নানা সাংবিধানিক সংকটে পড়েছিল পাকিস্তান। শেখ মুজিব সে-কথা ভোলেননি বলেই দ্রুত সংবিধান প্রণয়নে যত্নবান হয়েছিলেন। ড. কামাল হোসেনকে আইনমন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁর সংবিধান-বিশেষজ্ঞতার কারণে। তাঁর এইসব সিদ্ধান্তের মধ্যে একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক ও দূরদর্শী রাজনীতিকের পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁর নেয়া আরও অনেক সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট সময় তাঁকে দেয়া হয়নি। কিন্তু ব্যর্থতার দায় চাপানো হয়েছে। তাঁর যে-সব পদক্ষেপ ভুল বলে অনেকের মনে হয়, প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে সে-সবের তিনি কী কী অদল-বদল করতেন তাও আজ আর কারও জানার উপায় নেই।

এই সবকিছু বিবেচনায় তাঁর জীবনের বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন জরুরি। এখনও তাঁর হত্যাকাণ্ডের বিচার সম্পন্ন হয়নি, এখনও তাঁর মৃত্যুর অভিঘাত মানুষের মন থেকে মুছে যায় নি, এখনও তাঁর মৃত্যুজনিত কারণে সুবিধাভোগীরা ক্ষমতায় বা ক্ষমতার আশেপাশেই থাকছে। ফলে তাঁর জীবনের বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন এখনও অনেক দুরূহ কাজ। তবু আমরা নিশ্চয়ই এ-কথাও বলতে পারি যে, তাঁর কর্মময় জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতার নির্মোহ মূল্যায়নের প্রাথমিক পর্ব এখনই শুরু হয়ে গেছে বা আয়োজন সম্পন্ন হয়ে গেছে। আমাদের শুধু লক্ষ রাখা উচিত তাঁর জীবনী রচনার কোনও প্রামাণ্য উপাদান যেন অসাবধানতাবশত হাতছাড়া হয়ে না যায়।